

নেহরু বাল পুস্তকালয়

চা নিয়ে চইহই

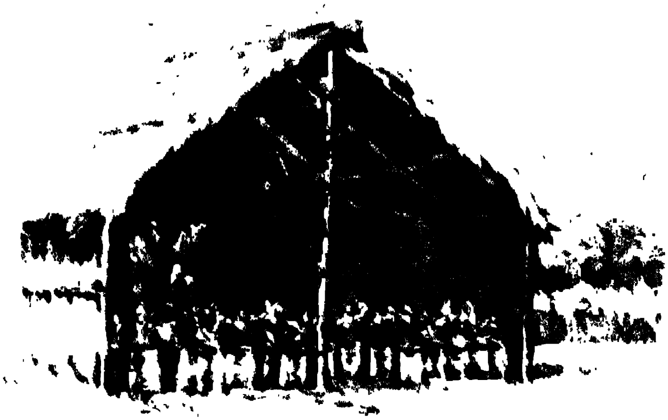
অরূপকুমার দত্ত

ছবি
মৃণাল মিত্র

অনুবাদ
অনুরাধা ঘোষ



ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইণ্ডিয়া



ISBN 81-237-0663-4

প্রথম প্রকাশ : 1993 (শক 1915)

মূল্য : 7.50 টাকা

A STORY ABOUT TEA *(Bengali)*

নির্দেশক, ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইণ্ডিয়া, এ-5, গ্রীন পার্ক, নয়াদিল্লি 110016 কর্তৃক প্রকাশিত

প্রথম পরিচ্ছেদ

মিটার গেজের মস্ত লম্বা ট্রেনটা পথের ধারে ছোট্ট একটা স্টেশনে এসে হঠাৎ দাঁড়িয়ে গেল। ড্রাইভার এমন জোরে ব্রেক কষল যে রজবীর সিংয়ের ঘুম ভেঙে গেল। রজবীর শিখ, বয়স তেরো। বন্ধু প্রাঞ্জল জানলার ধারে বসে একটা ডিটেকটিভ বই পড়ছিল।

প্রাঞ্জল আসামের ছেলে, রজবীর সিংয়ের বন্ধু। দিল্লিতে দুজনে একই ক্লাসে পড়ে। প্রাঞ্জলের বাবা আসামে এক চা বাগানের ম্যানেজার। প্রাঞ্জল তাই বন্ধুকে নিমন্ত্রণ করল গরমের ছুটিটা ওর সঙ্গে ওদের বাড়ীতে কাটাতে। রজবীর মহানন্দে রাজি হয়ে গেল।

দিল্লি থেকে আসাম অনেকখানি পথ। দু'দিন দু'রাত ওরা ট্রেনেই কাটাল পথের নানান মনোরম দৃশ্য দেখতে দেখতে। এখন আর বেশী পথ বাকি নেই; প্রায় পৌঁছেই গেছে।

প্রাঞ্জল সোৎসাহে বলল, "আচ্ছা ঘুম কাতুরে তো। ওঠ! এর পরের স্টেশন মরিয়ানীতে আমাদের নামতে হবে। চট করে এক কাপ চা খেয়ে নে, ঘুম কেটে যাবে। জানিসই তো, চায়ে ক্যাফিন আছে।"

"আমার তৈরি হতে সময় লাগবে না," বলেই রজবীর বিছানা থেকে এক লাফে নেমে নিজের জিনিসপত্র গুছিয়ে, মুখ হাত ধুয়ে, কাপড় ছেড়ে বন্ধুর পাশে বসে পড়ল। বাইরে তখন "চা গরম..... গরম চা..." বলে ফেরিওয়ালারা গলা ছেড়ে হাঁক দিচ্ছে। ওদের জানলার কাছে এসে একজন বলল, "চা সাহেব?"



"দাও তো। দু কাপ", প্রাঞ্জল বলল।

গরম চা ওরা জুৎ করে খেল। শুধু ওরা কেন, কামরার প্রায় সকলেই নিল।

"জানিস, সারা পৃথিবীতে প্রতিদিন প্রায় আশি কোটি কাপ চা খাওয়া হয়?"—রজবীর বলল।

প্রাঞ্জল অবাক হয়, "তাই নাকি? সত্যি? চা তো তাহলে সকলের খুব প্রিয়!"



ট্রেন ছাড়ল। প্রাঞ্জল আবার তার ডিটেকটিভ বইতে মুখ গুঁজে বসল। ডিটেকটিভ গল্প রজবীরেরও কিছু কম ভাল লাগে না, কিন্তু এখন তার পুরো মনটা পড়ে আছে বাইরের মনোরম দৃশ্যের দিকে। চারিদিকে শুধু সবুজ আর সবুজ। সবুজের এমন ছড়াছড়ি রজবীর আগে কখনো দেখেনি। আস্তে আস্তে সবুজ ধান ক্ষেত শেষ হয়ে আরম্ভ হল চা বাগানের ঝোপ।

সেটাও কিছু কম সুন্দর নয়। ঘন অরণ্য ঘেরা পাহাড়ের কোল ঘেঁসে, যতদূর চোখ যায়, অসীম সমুদ্রের মতন চারিদিকে কেবল চা গাছের ঝোপ।

চা গাছের ছোট ছোট ঝোপ ছাড়িয়ে উঠেছে লম্বা, ঘন, বড় বড় ছায়া গাছ আর সুচারুভাবে সাজান চা গাছের সারির মধ্যে কাজে ব্যস্ত মানুষগুলো দেখাচ্ছে ঠিক যেন ছোট ছোট

খেলার পুতুল। বেশ কিছুটা দূরে, বিশ্রী ধরনের মস্ত বড় বাড়ী আর তার চিমনি থেকে গল গল করে ঘন কালো ধোঁয়া।

রজবীর মহা উৎসাহে বলে উঠল, "এই প্রাঞ্জল, দেখ দেখ! একটা চা বাগান।"

প্রাঞ্জল তো চা বাগানেরই মানুষ। রজবীরের মতন অত উৎসাহ ওর একটুও নেই।

প্রাঞ্জল বলল, "এটা যে চায়েরই দেশ, সারা পৃথিবীতে আসামেই সব চেয়ে বেশী চা বাগান। দাঁড়াও না, এত চা বাগান দেখবে যে সারা জীবনের জন্য যথেষ্ট।"

রজবীর বলল, "চা নিয়ে আমি যতটা পেরেছি পড়াশুনা করেছি"। ঠিক কবে কোথায় চা আবিষ্কার করেছিল, তা সঠিক কেউই জানে না, তবে গল্প অনেকই আছে।"

"যেমন?"

"যেমন ধর, চীন দেশের সম্রাট, যিনি খাবার আগে সব সময় জলটা ফুটিয়ে নিতেন। একদিন যে গাছের ডাল দিয়ে জলটা গরম করা হচ্ছিল তারই কয়েকটা পাতা জলে পড়ে গেল আর জলটা অপূর্ব গন্ধে ভরে উঠল। লোকে বলে সেগুলো নাকি ছিল চা পাতা।"





"যত সব গাঁজা," প্রাঞ্জল ব্যঙ্গ করে হাসল।

"আমাদের দেশেও একটা গল্প আছে। বোধীধর্ম নামে এক বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর ধ্যানে বসলেই ঘুমে চোখ ঢুলে আসত বলে তিনি চোখের পাতা কেটে ফেলে দেন। সেই চোখের পাতা থেকে জন্মাল দশটা গাছ আর সেই গাছের পাতা জলে ফুটিয়ে খেলে আর নাকি ঘুম আসত না।" রজবীর বলে চলে, "চায়ের চলন প্রথম হয় চীন দেশে, প্রায় 2700 বছর আগে। আসলে 'টি', 'চা', 'চিনি' এইসব কথাগুলো চীন থেকেই এসেছে। ইউরোপে চায়ের প্রথম প্রচলন হয় ষোড়শ শতাব্দীতে। তখন অবশ্য ওরা চা ওষুধ বলেই খেত, ঠিক পানীয় বলে নয়।"

মারিয়ানী স্টেশনে ট্রেন থামল। জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়ে ওরা নেমে পড়ল ভীড়ে উপছে পড়া প্ল্যাটফর্মে।

প্রাঞ্জলের মা বাবা এসেছিলেন ওদের নিতে। সঙ্গে ছিল প্রাঞ্জলের ছোট বোন অলকা আর ওদের পোষা অলসেশিয়ান কুকুর ট্যাফি।

ওদের নিয়ে গাড়ী ছুটল ঢেকিয়াবাড়ীর দিকে। প্রাঞ্জলের বাবা সেখানকার এক চা বাগানের ম্যানেজার।

ঘণ্টাখানেক চলার পর বড় রাস্তা ছেড়ে গাড়ী মোড় ঘুরল। একটা কাঠের সাঁকো পার হলেই ঢেকিয়াবাড়ী চা বাগান।

কাঁকর বেছানো পথের দু ধারে একরের পর একর জুড়ে সমানভাবে ছাঁটা সারি সারি চা গাছের ঝোপ। তার মধ্যে মেয়েরা গাছের নতুন ফোটা পাতা তুলছে। পিঠে বাঁশের ঝুড়ি পাছে জামা কাপড় নোংরা হয়ে যায় তাই পোশাকের ওপর প্লাস্টিকের 'এপ্রন'।

সামনে চায়ের পাতা বোঝাই ট্রেলার সমেত একটা ট্র্যাকটর। সেটাকে পথ ছেড়ে দিয়ে প্রাঞ্জলের বাবা গাড়ীটা ধীর করলেন।

"এখন তো চায়ের পাতা দ্বিতীয় বার ফোটার সময়, তাই না, মিঃ বড়ুয়া—যা মে মাস থেকে জুলাই পর্যন্ত চলে আর এই সময়কার চা-ই সব চেয়ে ভাল। তাই না?"— রজবীর জিজ্ঞেস করে।

অবাক হলেন প্রাঞ্জলের বাবা। বললেন, "বাঃ, তুমি তো দেখছি আসার আগেই সব জেনে ফেলেছ।"

বিনয়ের সুরে রজবীর জবাব দিল, "সব নয় মিঃ বড়ুয়া, এখানে থেকে এখনও অনেক কিছু জানার বাকি আছে।"

"মিঃ বড়ুয়া নয়, আমায় তুমি কাকা বোল," থেমে আবার বললেন, "নিশ্চয়। আজ দুপুরেই তোমায় বাগানে নিয়ে গিয়ে দেখিয়ে দেব, কেমন করে চা তৈরি হয়।"

গেট পেরিয়েই ম্যানেজারের মস্ত দোতলা বাংলো বাড়ী। বছর পঞ্চাশেক আগে কোন একজন সাহেব এটা বানিয়েছিলেন। বাড়ীর চারধারে প্রশস্ত জমি সমান করে ছাঁটা, ছোট বাঁশের ঝোপ দিয়ে ঘেরা। সামনের লনটা ঠিক যেন সবুজ ঘাসের কার্পেট আর সারা বাগান জুড়ে লাল, নীল, হলদে ফুলের অপূর্ব বাহার।

বারান্দার সিঁড়িতে বসেছিল হাফ প্যান্ট আর সার্ট পরা ধূসর রংয়ের কিশোর। মুখটা তার দুষ্টুমিতে ভরা। প্রাঞ্জলকে দেখেই একমুখ মিষ্টি হাসিতে তার দাঁতগুলো ঝলমল করে উঠল।

প্রাঞ্জল চিৎকার করে ডাক দিল, "এই মোংলা! এই দেখ, আমার বন্ধু রজবীর। আয় এদিকে, আলাপ করিয়ে দি।"

মোংলা দৌড়ে এসে হাসতে হাসতে হাত বাড়িয়ে রজবীরের হাতটা চেপে ধরল।

"মোংলা হল আমাদের ফ্যাকটরির চৌকিদার বিরজীর ছেলে। আমরা খুব মজা করি। মোংলা আর আমি। মোংলা গুলতির রাজা আর হেন জিনিস নেই যা ও জানে না।"

"এবার আমি পালাই। আজকাল আমি পোকা মারার ওষুধ ছড়ানোর দলে। চট করে তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলাম। জানতে পারলে সর্দার আমায় জ্যান্ত গিলে ফেলবে," বিদায়ের হাত নেড়ে মোংলা হাওয়া হয়ে গেল।



দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

দুপুরবেলায় মিঃ বড়ুয়া রজবীরকে নিয়ে বাগানে বেড়াতে গেলেন। সঙ্গে গেল প্রাঞ্জল, অলকা আর ট্যাফি। আট শ একরের মস্ত বাগান ঢেকিয়াবাড়ী। ওরা তাই গেল মিঃ বড়ুয়ার জীপে করে।

"শুরু করা যাক চা গাছের চারা যেখানে রাখা হয় সেইখান থেকে, কি বল?" বললেন মিঃ বড়ুয়া। জীপে যেতে যেতে উনি আরও বললেন, "চা গাছের বড্ড যত্ন নিতে হয়। গাছগুলোকে সুস্থ এবং সবল রাখার জন্যে জমিতে নাইট্রোজেন, পটাস আর ফসফেটের সার নিয়ম করে দিতে হয়। এইসবের মধ্যে নাইট্রোজেনই হল প্রধান। আর অন্য গাছের যেমন ফল তোলা হয় তেমনি চা গাছের পাতা। পাতাই এ গাছের প্রাণ বলে তাদের সজীব রাখার জন্যে সর্বদা নাইট্রোজেনের দরকার।

"বুঝলে রজবীর, কখনো কখনো তারা আবার অসুস্থ হয়ে পড়ে। যেমন ধর লাল মরচে, ব্লিস্টার ব্লাইট বা কালো পচ। তখন আমাদেরই ডাক্তার হয়ে রোগ যাচাই করতে হয়, আর উচিত মত ওষুধ দিতে হয়।"

চারা গাছের ঘরটা চওড়া আর নিচু। চারিদিকে বাঁশের দেওয়াল আর ওপরে খড়ের পাতলা ছাউনি। ঘরের একদিকে মাটির কেয়ারি। অন্যদিকে হাজারে হাজারে পলিথিন ব্যাগে চা গাছের কলম।

কলম তৈরির জন্য যে বিশেষ গাছ আলাদা করা থাকে তাই থেকে আঁব আর একটামাত্র পাতা সমেত এক ইঞ্চি পরিমাণ ছোট্ট ডাল কেটে কলম করা হয়। সেই কলম মাটির কেয়ারি অথবা মাটি ভর্তি পলিথিন ব্যাগে পুঁতে দেওয়া হয়। আন্দাজ দশ সপ্তাহের মধ্যে ডালের নিচে শিকড় জন্মায় আর বছর খানেক পরে সেগুলো পুঁতে দেওয়া হয় বাগানে।



মিঃ বড়ুয়া বললেন, "বীজের জন্যেও আলাদা ব্যবস্থা আছে। তবে আজকাল সবাই প্রায় কলমের চাষই পছন্দ করেন, কারণ তাতে গাছ বিশুদ্ধ থাকে। কোন বিমিশ্রণের ভয় থাকে না। এইভাবে কলম থেকে যে গাছ হয় তাতে আসল গাছের সব গুণই প্রায় পুরোপুরি বজায় থাকে।"

"বীজের তাহলে দরকার কি?" রজবীর জানতে চাইল।

"বীজের প্রয়োজন হয় ইচ্ছে মত সংমিশ্রণ করে ভাল শ্রেণীর গাছের জন্য। তাছাড়া বীজ দামে সস্তা আর কলমের মতন অত বেশী যত্ন লাগে না।"

"আচ্ছা কাকাবাবু, চারা গাছ বড় হয়ে চায়ের পাতা দেওয়ার উপযুক্ত হতে কত সময় লাগে?"

"পাতা প্রথম বছর থেকেই তোলা যেতে পারে, তবে পুরোপুরি উপযুক্ত হতে প্রায় বছর পাঁচেক লাগে। চা গাছের জীবন বলতে গেলে মানুষেরই মতন—ধর ষাট বছর।"



ওরা সবাই আবার জীপে উঠে পড়ল। মিঃ বড়ুয়া ওদের নিয়ে চললেন বাগানের সরু পথ দিয়ে। এক জায়গায় একদল লোক গাছে ওষুধ ছড়াচ্ছিল। মোংলা উৎসাহে হাত নাড়ল। মিঃ বড়ুয়া জীপ থামিয়ে বললেন, "এস, এখানেই নামা যাক।"

চা ঝোপের সারিতে সারিতে পৌঁছোতে ওদের একটা বেশ গভীর নালা পার হতে হল। তার ওপর পুলটা একটা সরু সুপুরি গাছের গুঁড়ি দিয়ে তৈরি। সবাই স্বচ্ছন্দে পেরিয়ে গেল, কিন্তু রজবীর পড়ল বিপদে। ত্রস্ত পায়ে দু-চার পা গিয়েই এদিক ওদিক দুলতে লাগল, মনে হল যেন কোন দড়ির ওপর দিয়ে হাঁটছে। ঠিক যখন উল্টে পড়ে আর কি, তখন কোনরকমে নিজেকে সামলে নিয়ে পুলটা পেরিয়ে এল।

সবাই ওকে বাহবা দিল। এমন কি ট্যাফিও সজোরে ডেকে উঠে যেন সায় দিল।

রজবীর বলল, "ওরে বাবা, কত নালা? সারা বাগানটাকে জালের মতন জড়িয়ে আছে।"

মিঃ বড়ুয়া বুঝিয়ে বললেন, "এগুলো বাগানের জল নিকাশের কাজ করে। চা গাছের জন্য সব চেয়ে ভাল হচ্ছে গরম অথচ জলীয় আবহাওয়া এবং মাঝারি থেকে প্রবল বর্ষা। কিন্তু জল যদি জমা হয় তাহলে শিকড়ে পচ ধরে আর গাছ যায় শুকিয়ে। এই নালাগুলো তাই জল টেনে নেওয়ার জন্যে দরকার।"

ওরা গিয়ে পড়ল ওষুধ ছড়ান দলের কাছে। দলের প্রত্যেকটি লোকের পিঠে ওষুধ ছড়ানোর মেশিন আঁটা। ওরা সবাই মেশিন চালিয়ে মাটির ওপর ওষুধ ছড়াচ্ছিল।

"ওরা আগাছা মারার ওষুধ ছড়াচ্ছে," মিঃ বড়ুয়া বললেন, "কীটনাশক হলে গাছের ওপর দিও। মিকানিয়া, বাগ্রাকোট ইত্যাদি নানান রকমের আগাছা চা ঝোপের তলাটা ভরিয়ে দিয়ে গাছের বাড় প্রায় বন্ধ করে দেয়।"

"আপনি কীটনাশকের কথা বলছিলেন। চা গাছেও বুঝি পোকা ধরে?" রজবীর জানতে চাইল।

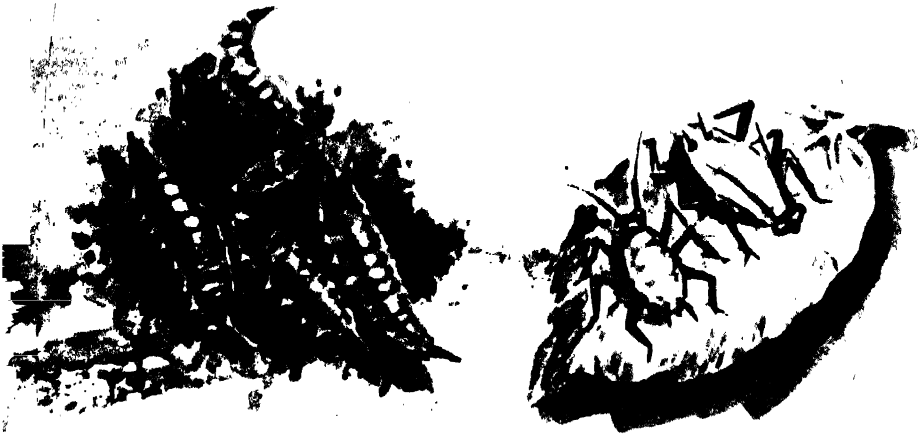
"ধরে বৈকি, নিশ্চয় ধরে। লুপার্স, থ্রিপস্, সবুজ মাছি, বিছুটি পোকা ইত্যাদি নানান রকমের পোকা গাছের যথেষ্ট ক্ষতি করতে পারে।"

মোংলা মস্ত মস্ত পা ফেলে আর হাসতে হাসতে চলে এল ওদের কাছে।

"আমরা কাল নদীতে যাব সাঁতার কাটতে," প্রাঞ্জল বলল মোংলাকে, "আসবি না কি আমাদের সঙ্গে?"

"নিশ্চয়! কখন?"





"দুপুর বেলায়। সকালে বাবা রজবীরকে নিয়ে যাবেন ফ্যাকটরি দেখাতে।"

"ঠিক আছে। তারপর না হয় নদীতে মাছ ধরাও যাবে। আমি কিছু মাছ ধরার জাল ছড়িয়েছি। দেখা দরকার কি হল," মোংলা বলল।

একদল লাল ঠোঁট সবুজ টিয়া যেন আপত্তির সুর তুলে মাথার ওপর দিয়ে সশব্দে উড়ে গিয়ে বসল পাশের বড় ছায়া গাছে। স্বচ্ছ নীল আকাশের গায়ে একজোড়া গাং চীল আনন্দে ঘুরপাক খাচ্ছিল আর বহু দূরে সাদা রংয়ের একটা সারস উড়ে গেল তার বাসার দিকে।



তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মোংলাকে বিদায় দিয়ে আবার যাত্রা শুরু। বিকেলের ঢলে পড়া আলো ঘন ছায়া গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে চুপি চুপি এসে ছড়িয়ে পড়েছে চা ঝোপের সারির ওপর, কোথাও পাশে, কখনো বা নিচে। চারিদিকে আলো ছায়ার অপূর্ব আলপনা। রজবীর ছায়া গাছের রাজকীয় সৌন্দর্যে মোহিত হয়ে নানা কথা বলল।

"ঐ গাছও বিশেষ দরকারি," মিঃ বড়ুয়া বললেন, "ওগুলো সূর্যের আলো সামলে নিয়ে চা গাছের পাতার জন্যে ঠিক যে পরিমাণ উত্তাপের প্রয়োজন অর্থাৎ 25 থেকে 30 ডিগ্রী সেলসিয়াস, সেইটা বজায় রাখতে সাহায্য করে। গ্রীষ্মকালের গরম আলো যদি সরাসরি পাতার ওপর পড়ে তাহলে উত্তাপের মাত্রা 40 ডিগ্রী পেরিয়ে যায় আর পাতা পুড়ে হয় কালো ঝুল।"

"কিন্তু কাকাবাবু," রজবীর আপত্তির সুর তুলে বলল, "গাছের বাড়ের জন্যে সূর্যের আলো তো বিশেষ দরকার, তাই না?"

"সে কথা ঠিক। কিন্তু বেশী হলে আবার বিপদও আছে। সারি সারি করে ছায়া গাছ পাতা হয় উত্তর-দক্ষিণ করে। সূর্য যখন পূর্ব দিকে ওঠে তখন গাছের পশ্চিম দিকের চা গাছের ওপর ছায়া পড়ে। আবার বিকেলবেলায় পূবের ঝোপে ছায়া পড়ে। এই ভাবে ছায়া-গাছের জন্য সূর্যের আলো সমান ভাবে ভাগাভাগি হয়ে যায়। তাছাড়া, যারা কাজ করে

তারাও ছায়া পায়।"

"আর, শীতকালে?" রজবীর জানতে চাইল, "তখনকার অল্প আলোও তো ছায়া-গাছ আটকে দেয়।"

"ঠিক তা নয়। সে কথা ভেবে চিন্তে তবে এই গাছ ঠিক করা হয়েছে। এগুলো হল অলবিজিআ ওডোরাটিসিমা। অকটোবরে যখন শীত শুরু হয়, তখন এই গাছের পাতা সব ঝরে যায়। আবার মার্চ মাসে নতুন পাতা এসে গ্রীষ্মকালে ছায়া দেয়।"

রজবীর খুশী নয়, "কিন্তু তাতে জমির উর্বরতা নষ্ট হয় না?"

"ঠিক উল্টো। আসলে প্রচুর পরিমাণে নাইট্রোজেন জুগিয়ে জমির উর্বরতা আরও অনেক বাড়িয়ে দেয়। তাছাড়া, গাছের পাতা মাটিতে পড়ে যখন পচে যায় তখন সারের কাজ করে। চা বাগানের সবকিছুই কার্য্যকরি, কিছুই অবান্তর নয়। যাক, অনেক হল। এবার বাড়ী গিয়ে...."

"গরম গরম চা," কথাটা শেষ করল প্রাঞ্জল। আর সবাই হো হো করে হেসে উঠল।

রাত যখন নামল ছোটরা উঠে গিয়ে বসল দোতলার বারান্দায়। দলে দলে জোনাকী চারিদিকে চিক চিক করে উঠল নির্জন রাতের জমাট অন্ধকারে। দূরের গাছ থেকে একটা পেঁচা ডাক দিল আর অল্প বাতাসে ভেসে এল কাছাকাছি কোন বস্তি থেকে ঝুমুর গানের রেশ।

হঠাৎ রজবীর লক্ষ্য করল, কিছু দূরে আলোর ঝলকানি। মনে হল সেটা যেন লুকোচুরি খেলছে কখনো এগিয়ে এসে আবার কখনো পিছিয়ে গিয়ে।

"এই, ওটা কি?" চমকে রজবীর চিৎকার করে উঠল।

"আলেয়া," প্রাঞ্জল বলল।

"আলেয়া হল কিপ্টে বুড়োদের ভূত। মাটিতে পোঁতা সোনা পাহারা দেয়," বিজ্ঞের মতন অলকা ওদের বুঝিয়ে দিল।

"ভূত?" রজবীর ভয় পায়।

"ধ্যাৎ। বোকা। আলেয়া হল আগুনের গোলা, জলা জমির গ্যাসে জ্বলে," প্রাঞ্জল বলল।



"বোকার মতন কথা বোল না," অলকা প্রতিবাদ করে বলল, "বুড়ী জলেশ্বরী আমায় নিজে বলেছে যে, ঐ রকম একটা জিনিস ওরই চোখের সামনে বুড়ো মানুষের চেহারা নিয়েছিল।"

এরপর কারো মুখে আর কোন কথা নেই। ওদের নীরবতা ভাঙল যখন প্রাঞ্জলের মা-বাবা ওপরে উঠে এলেন।

"চা বাগানের জীবন মনে হয় খুবই চুপচাপ, তাই না?" রজবীর জানতে চায়।

"চুপচাপ, কিন্তু চাঞ্চল্যও যথেষ্ট আছে বৈ কি," মিঃ বড়ুয়া বললেন, "যেমন ধর, বিষাক্ত সাপ—কেউটে। তুমি তো জান, ইংরেজরা আসামে বুনো চা গাছ আবিষ্কার করেছিল ঊনবিংশ



শতাব্দীর মাঝামাঝি এবং তারপরই আরম্ভ করেছিল চায়ের চাষ। সেই সময় তাদের অনেক বিপদের মুখোমুখি হতে হয়েছিল। যেমন কলেরা, প্লেগ, নানান বন্য জন্তু, বহু প্রাকৃতিক দুর্যোগ। এখন অনেক উন্নতি হয়েছে ঠিকই, কিন্তু তাই বলে আমাদেরও উত্তেজনা কিছু কম নয়।"

"চিতাবাঘের কথাটা ওদের বলো না," মিসেস বড়ুয়া স্বামীকে বললেন।

"চিতাবাঘ? কি হয়েছিল, কাকাবাবু ?" রজবীর উদগ্রীব হয়ে প্রশ্ন করল।

"কখনো কখনো পাশের জঙ্গল থেকে জন্তু জানোয়ার ঠিকরে বেরিয়ে আসে আর চা বাগানে গণ্ডগোল বাঁধিয়ে দেয়। বছর দুয়েক আগে আমি একটা মানুষ খেকো রয়েল বেঙ্গল টাইগার মেরেছিলাম। মাঝে মাঝে বুনো হাতিও খুব বিপদ ঘটায়।

"গত দিন পনের ধরে একটা চিতাবাঘ আমাদের লোকদের বড় জ্বালাতন করছে। শাওন সর্দার বলছিল, চিতাটা নাকি ওর বাড়ীর চারিদিকে ঘোরাঘুরি করে। ওর একটা বলদ তুলে নিয়ে গেছে।"

"সর্দার কি... মানে কাকে বলে?" রজবীর জানতে চাইল।

"চা বাগান অনেকখানি জায়গা জুড়ে ছড়িয়ে থাকে আর হাজার হাজার কর্মী কাজ করে। কাজের সুবিধার জন্য তাদের ছোট ছোট দলে ভাগ করে দেওয়া হয়। সেই সব দলের যারা নেতা, তাদেরই বলা হয় সর্দার। মানে, দলের ক্যাপ্টেন আর কি।"

"চিতাটাকে ধরার জাল পাতা হয়নি, বাবা? প্রাঞ্জল প্রশ্ন করল।

"পেতেছিলাম। আমি তিনদিন ধরে বাগান পাহারা দিয়েছিলাম। কিন্তু তাকে দেখতেই পেলাম না। তারপর টোপ ফেলে একটা ছাগল বাঁধলাম। কিন্তু সে এড়িয়ে গেল। মহা চালাক ঐ চিতাটা। পায়ের দাগও ফেলে না। লোকগুলো এত তাতে ভয় পায় যে, রাতে বাড়ীর বাইরে এক পা ফেলে না।"

রজবীর আরও কিছু শুনতে চাইছিল, কিন্তু শোনা আর হল না। খাবার ডাক পড়ল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

পরদিন সকালে সবাই তাড়াহুড়ো করে বসল জলখাবার খেতে।
"চায়ে আর একটু দুধ দেব, রজবীর?" প্রশ্ন করলেন মিসেস বড়ুয়া।
"না কাকীমা। চা একটু কড়া না হলে আমার ভাল লাগে না।"

"তোমার কাকাবাবু তো দুধ না দিয়েই চা খান।"

"ঠিক," মাথা নাড়লেন মিঃ বড়ুয়া। বললেন, "চায়ের স্বাদ সম্বন্ধে মানুষে মানুষে যেমন ভিন্ন মত, দেশে দেশেও তাই। আমরা চা খাই দুধ চিনি দিয়ে, কিন্তু চীনা আর জাপানীরা তা খায় না। ওরা খায় গ্রীন টি।"

"সেটা আবার কি কাকাবাবু?" রজবীর জানতে চাইল।

"তৈরি চায়ের পাতা তিন রকমের হয়—অর্থোডকস্ বা সনাতনী, সিটিসি আর গ্রীন টি। গ্রীন টি তৈরি হয় পাতায় ভাপ দিয়ে তার এনজিমস্ নষ্ট করার পর তাদের শুকিয়ে নিয়ে। এতে চায়ের পাতা গোঁজিয়ে ওঠে না বলে পাতার আসল গুণ সব বজায় থাকে।

"চীনা আর জাপানীরা গ্রীন টি দিয়ে চা করে কিন্তু দুধ চিনি ব্যবহার করে না। কখনো কখনো আবার মিষ্টি গন্ধের জন্য চামেলী ফুলের কুঁড়ি তাতে ছড়িয়ে দেয়। জাপানীরা তো চা খাওয়াটাকে জাতীয় অনুষ্ঠান করে ফেলেছে—যেটা ওদের জীবন আর জাতীয় কৃষ্টির ঐতিহ্য।"

"চট করে চা তৈরির ব্যবস্থাও তো আছে, না বাবা?" অলকা প্রশ্ন করল।

"আছে। ঠিক ঐ কফির মতন ইনস্টান্ট টি। এক কাপ গরম জলে ছোট ব্যাগ ভর্তি চা ফেলে দিলেই হল। চা-বৈজ্ঞানিকেরা আবার কার্বনযুক্ত চা করে বোতলে পোরার পদ্ধতিও আবিষ্কার করেছেন, যার ফলে অন্যান্য পানীয়ের মতন বোতল খুলে ঠাণ্ডা চাও খাওয়া যাবে।"

"তাই বুঝি? এরপর আবার কি বের হবে কে জানে।" প্রাঞ্জল অবাক হয়ে চেয়ে রইল।

"কে বলতে পারে। রোজই তো কিছু না কিছু আবিষ্কার হচ্ছে।" তারপর ব্যস্ত হয়ে মিঃ বড়ুয়া তাড়া দিয়ে বললেন, "আর দেরী নয়। চলো এবার ফ্যাকটরি যাওয়া যাক।"

ঠিক এই সময় গলা ফাটিয়ে চিৎকার করতে করতে একটা লোক ছুটে এল।

"বড় সাহেব। বড় সাহেব....." লোকটার গলা সপ্তমে আর নিঃশ্বাস বন্ধ হবার জোগাড়।

"বিরচী। মোংলুর বাবা"—প্রাঞ্জল বলল রজবীরকে।

"বড় সাহেব," হাঁপাতে হাঁপাতে কোন রকমে বিরচী বলল, "কাল চায়ের গুদামে চোর ঢুকে সব চায়ের পেটি নিয়ে গেছে।"

"সে কি। কি করে?" মিঃ বড়ুয়া উত্তেজিত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "কটা পেটি ছিল গুদামে?"

'ঠিক জানি না, বড় সাহেব। ডেসপ্যাচ ক্লার্ক ডেকাবাবু আপনাকে খবর দিয়ে নিয়ে যেতে বললেন।"

পুলিশকে টেলিফোন করে খবরটা দিয়ে মিঃ বড়ুয়া ছোটদের জীপে তুলে ছুটলেন চায়ের গুদামে।

এলান ছড়ান ফ্যাকটরিটা কাঁটা তারের বেড়া দিয়ে ঘেরা। আসল কারখানার কিছু দূরে এলাকার এক কোণে চা পেটির গুদাম। ইতিমধ্যেই সামনে তার বেশ বড় ধরণের ভীড়। বাগানের তিনজন সহকারি ম্যানেজারও সেখানে উপস্থিত। বড় সাহেবকে আসতে দেখে ডেকাবাবু ছুটে এসে কাঁদ কাঁদ হয়ে বললেন, "স্যার 40টা পেটি চুরি হয়ে গেছে।"

"খুলে বল সব কথা।" মিঃ বড়ুয়া বিরক্ত হয়ে বললেন।

"স্যার, আজ সকালে ওগুলো পাঠাবার কথা। কাল বিকেলে নিজের হাতে আমি সামনের দরজায় তালা দিয়েছিলাম। ঐটাই গুদামে ঢোকার একমাত্র রাস্তা। আজ সকালে দরজা খুলে দেখি গুদাম একেবারে খালি, কিন্তু আশ্চর্য কথা, তালাটা ঠিকই ছিল।"

"কোন সাইজের পেটি"

"বড়। যাতে 50 কেজি চা ধরে।"

"তার মানে চুরি গেছে 2000 কেজি। ভাল কোয়ালিটি চা মানে প্রায় 50,000 টাকার লোকসান।"

"প্রায় কেন কাকাবাবু? চায়ের দাম কি ঠিক করা থাকে না?" রজবীর প্রশ্ন করল।

উত্তরটা মিঃ বড়ুয়া সংক্ষেপে দিলেন কিন্তু খুব শান্ত ভাবে, "কি জান রজবীর, চা তো বাগান থেকে সোজা বিক্রি হয় না। আমরা পাঠিয়ে দি আমাদের লোকদের কাছে গুয়াহাটি কিম্বা কলকাতার নীলাম কেন্দ্রে। সেখানে চা পরীক্ষকরা চেখে দেখে দাম ঠিক করেন, আর তারই ভিত্তিতে নীলামে যে সবচেয়ে বেশী দর দেয়, তাকেই চা দিয়ে দেওয়া হয়।" তারপর ঘুরে ফ্যাকটরির চৌকিদার বিরচীকে ডেকে প্রশ্ন করলেন, "কাল রাত্রে অস্বাভাবিক কিছু তোমার নজরে পড়েছিল?"

"না সাহেব। গুদামের ধারে-কাছে কেউ আসেনি।"

"ঘুমিয়ে পড়নি তো?"

"না হুজুর, একদম না। শাওন সেই যে চিতাবাঘের কথা বলেছিল তারপর থেকে আমি সারারাত অনেক বেশী সজাগ থাকি। সত্যি হুজুর।"

ওঁরা গুদামে ঢুকলেন। একটা ঘরের বাড়ী। মেঝেটা ঝকঝকে পালিস করা, কাঠের। কোথাও একটা জানলা নেই। ওপরের উজলদানি শক্ত লোহার গরাদ দিয়ে মোড়া। এককোণে ডেকাবাবুর টেবিল। ঢাকনাটার কিছুটা টেবিলের ওপর, বাকিটা একধারে ঝুলে আছে। এ ছাড়া পুরো গুদামটা খালি।

রজবীর আর প্রাঞ্জল দৃষ্টি বিনিময় করল। ডিটেকটিভ গল্প পড়ার অভিজ্ঞতা কাজে লাগাবার এই এক অপূর্ব সুযোগ। মিঃ বড়ুয়া আর অন্যেরা যখন আলোচনায় ব্যস্ত, ওরা দুজনে গুদামের চারধার ঘুরে ঘুরে রহস্য সন্ধানের সূত্র খুঁজতে লাগল। মেঝের ওপর হামাগুড়ি দিয়ে এদিক ওদিক দেখতে দেখতে রজবীর হঠাৎ চিৎকার করে উঠল, "প্রাঞ্জল, অলকা, শিপ্রীর এদিকে এস।"

মেঝের ওপর পরিষ্কার একজোড়া পায়ের দাগ।

"অলকা," প্রাঞ্জল প্রশ্ন করল, "এখানে কবে বৃষ্টি হয়েছিল রে?"

"হবে তা হপ্তাখানেক আগে।"

"অবাক কাণ্ড।" প্রাঞ্জল বলল, "এক হপ্তা আগে বৃষ্টি হয়েছে, বাইরের জমি শক্ত কাঠ,



অথচ এখানে কাদামাখা পায়ের স্পষ্ট ছাপ। কি করে হয়?"

"সূত্রটা ভাল মনে হচ্ছে।" রজবীর মন্তব্য করল।

আরও কিছু সূত্র পাওয়ার চেষ্টায় চারদিক ঘুরতে ঘুরতে রজবীর হঠাৎ আবিষ্কার করল একতাল হলদে কাদা। ওরা সেটা নিয়ে গেল মিঃ বড়ুয়ার কাছে। উনি ওটা দেখে কিছুটা

অবাক হলেন বটে তবে বুঝিয়ে বললেন, "বালি মেশান দো আঁশ মাটি এবং কিছুটা আম্লিক। দো আঁশ মাটিতে বালি আর মাটির পরিমান প্রায় সমান সমান, কিন্তু এই তালে বালির পরিমাণ কিছু বেশী। চা গাছের জন্য এই ধরণের মাটি অত্যন্ত ভাল, কারণ বালির মধ্যে দিয়ে জল গড়িয়ে যায়।"

"তা তো বুঝলাম, কিন্তু গুদামের মেঝেতে এই মাটি এল কি করে?"

আর একবার ভাল করে দেখে উনি বুঝলেন ওটা বাগানের নয়। কি করে আর কোথা থেকে ওটা এল যখন ভাবছেন ঠিক সেই সময় এল পুলিশ। আর ভাবা হল না। ওটা তাড়াতাড়ি



রজবীরের হাতে গুঁজে দিয়ে উনি দৃষ্টি দিলেন থানার বড় কর্তা মিঃ কোটকির দিকে। রজবীর মাটির তালটা কাগজে মুড়ে পকেটে পুরে নিল।

চুরির বৃত্তান্ত শুনে মিঃ কোটকি হতভম্ব হয়ে গেলেন। সামনের একমাত্র দরজা না খুলে চোর ভেতরে ঢুকল কি করে? একটু ভেবে বললেন, "চারদিকে ঘুরে ঘুরে তদন্ত করতে হবে।"

সভয়ে এগিয়ে এসে রজবীর আমতা আমতা করে বলল, "আমরা কিছু সূত্র পেয়েছি। দেখবেন আপনি?"

প্রাঞ্জল বলল, "বাবা, তদন্তে আমরাও কি যোগ দিতে পারি?"

বেশ একটু বিরক্ত হলেন কোটকি সাহেব। ভুরু কুঁচকে বললেন, "তদন্ত ছেলেখেলা নয়, মিঃ বড়ুয়া। এই ছেলে-ছোকরাদের বলুন, আমাদের কাজে বিরক্ত না করতে।"

"সত্যিই তো," মিঃ বড়ুয়া বললেন, "সরকারি অনুসন্ধানের কাজে বাইরের লোকের দখল দেওয়া উচিত নয়। তোমরা তো ঠিক করেছিলে নদীতে যাবে সাঁতার কাটতে। তাই না হয় যাও। দেখছই তো, আজ আর আমার পক্ষে তোমাদের ফ্যাকটরি দেখান সম্ভব নয়।"

ওঁদের কথায় আহত হয়ে অলকা আর দুই বন্ধু ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।



পঞ্চম পরিচ্ছেদ

করার কিছু আর ছিল না বলে ওরা ঠিক করল, নদীতে যাবে সাঁতার কাটতে। বাইরে দাঁড়িয়ে ছিল মোংলা। তাকেও সঙ্গে নিল। বাড়ীর পথে মোংলাকে সব কথা ওরা সবিস্তারে বলল। প্রোগ্রাম হের ফের হওয়ার খবরটা মিসেস বড়ুয়াদের জানিয়ে ওরা রওনা হল নদীর দিকে ট্যাফিকে সঙ্গে নিয়ে। নদীটা বাগানের দক্ষিণ সীমানার কিছু দূরে। খুব না হলেও বেশ খানিকটা পথ।

চুরির হাঙ্গামায় বাগানের কাজ কিন্তু থামেনি। পাতা তোলার কাজে কর্মীরা আপন মনে ব্যস্ত।

ওদের দেখে রজবীর বলল, "তোমাদের কর্মীরা কাজে বড় ঢিলে। ওরা যেভাবে পাতা তুলছে, সেই তুলনায় আমি ওদের আদ্দেক সময়ে ঢের বেশী পাতা তুলতে পারতাম।"

কথাটা শুনে মোংলার বেশ মজা লাগল। ওর হাসির আড়ালে সারা মুখটাই হারিয়ে গেল। বলল, "তাই বুঝি? আচ্ছা এস, দেখা যাক। ঐ তো আমার পিসী সুখোমনি। এস দেখি, কে বেশী পাতা তোলে, তুমি না পিসী?" তারপর পিসীকে ডাক দিয়ে বলল, "ও সুখোপিসী, আমাদের এই রজবীরবাবু পাতা তুলতে চান। দেবে?"

ওরা ঢুকল ভেতরে। সুখোপিসী হেসে ওদের স্বাগত জানালেন আর রজবীর দু মুঠো পাতা একটানে তুলে ফেলল।



"আরে ছোট সাহেব, ও ভাবে নয়," সুখোপিসী বলল, "হাতে যে পাতা আসে তা তুললেই হয় না। পাতা তোলার নিয়ম হল, দ্বিতীয় আর তৃতীয় পাতার মাঝখানে ডাঁটি ভেঙে দুটো পাতা আর সঙ্গে কুঁড়ি তোলা। এই....এই ভাবে..."

দক্ষ হাতের দু আঙুলে দুটো পাতা আর একটা কুঁড়ি তুলে সুখোমনি ছোট্ট একটা ডাল রঞ্জবীরের হাতে দিল। তাজা পাতা দুটো তুলতুলে নরম। আর কুঁড়িটা ফুলের নয়, একেবারে নতুন পাতা, তখন পুরোপুরি ফোটেনি।

সুখোমনি বুঝিয়ে বলল, "প্রতি বছর বর্ষাকালে নতুন পাতা গজায়। পুরোন নয়, এই নতুন পাতা দিয়েই চা তৈরি হয়।"



"যদি দুটোর বেশী পাতা তোলেন তাহলে সঙ্গে কুঁড়ি থাকলেও চা ভাল হয় না। সেই জনাই মাঝে মাঝে চা গাছের ছাঁটাই করতে হয়।"

মোংলা মাথা নেড়ে বলল, "ছাঁটাই না করলে চা গাছ মস্ত বড় হয়ে যায়। কেটে কেটে ছোট রাখা হয় বলেই ঝোপ হয়ে যায়, ডালপালা বেশী হয় আর পাতা তোলার জায়গা বাড়ে।"

"ঠিক তাই," সুখোমনি সায় দিয়ে বলল, "ঝোপটাকেও আবার কোমরের বেশী উঁচু হতে দেওয়া হয় না যাতে পাতা তোলার সুবিধা হয়।"

"আর আমি মুখ খুলছি না," রজবীর হাসতে হাসতে বলল।

বাগানের শেষ প্রান্তে কিছু খালি জমি যাতে চায়ের ঝোপ নেই, আছে বড় বড় পাতার কিছু ছোট বড় গাছ।

"এগুলো হল গোটমাল," প্রাঞ্জল বলল, "মাটিতে সার দেওয়ার কাজে লাগে। চারাঘরে যে কলম দেখেছিলে মনে আছে নিশ্চয়, সেগুলো এখানে পোঁতা হবে। এই সব গাছ সিট্রোনেলা, মিমোসা, গোটমাল ইত্যাদি, জমিকে উর্বর করতে খুব সাহায্য করে। পুরোন জমিকে একেবারে নতুন করে দেয়।"

"সিট্রোনেলা? সেটা তো এক রকম ঘাস, যা থেকে তেল পাওয়া যায়, তাই না?"

"ঠিক বলেছ। সেই তেলে লেবুর গন্ধ, যা সাবান আর সেন্টে ব্যবহার করা হয়। অনেক বাগানে ব্যবসার জনাও এই গাছের চাষ হয়।"

সামনেই বাগানের কাঁটা তার দিয়ে ঘেরা সীমানা। লোহার গেটটা টপকে আর কিছু জলা জমি পার হয়ে ওরা পৌঁছে গেল নদীর ধারে।

মাটির একটা মস্ত উঁচু বাঁধ, যাতে নদীতে বন্যা এলে পাশের জমিতে জল না ঢোকে। ওরা ঐ বাঁধের ওপর উঠতেই মাটি দেখে রজবীর মহা ব্যস্ত হয়ে উঠল। পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে লাগল। গুদাম ঘর থেকে যে মাটির তাল পেয়েছিল সেটা পকেট থেকে বার করল।

নাঃ, কোনই সন্দেহ নেই। মিলিয়ে দেখল দুটোই এক। উত্তেজিত হয়ে উঠল রজবীর। লাফিয়ে উঠে বলল, "চোরেরা নিশ্চয় এখানে এসেছিল।"

প্রাঞ্জল বলল, "কিন্তু এখানকার জমি তো শক্ত। ভিজে না হলে পায়ে লাগবে কেন?"

"তার একটাই কারণ হতে পারে, চোর নিশ্চয় নদীতে নেমেছিল," অলকা বলল।

এই নতুন সূত্রটা মনের মধ্যে সামলে নিয়ে দুই বন্ধু আর মোংলা নামল সাঁতার কাটতে।



ট্যাফিকে সঙ্গে নিয়ে অলকা গেল বাঁধের ওপর বেড়াতে।

হঠাৎ একটা বড় পাথরে হোঁচট খেয়ে অলকা হুমড়ি খেয়ে পড়ল। কিনারায় পড়ল বলে বাঁধ বেয়ে নিচে গড়াতে গড়াতে অলকা চিৎকার করে উঠল। তবে নদীতে আর পড়ল না। ঠিক তার আগে কোন রকমে একটা ঝোপ আঁকড়ে ধরে জলের ঠিক ওপরে ঝুলে রইল।

অলকার চিৎকার আর কুকুরের ডাক শুনে ছেলেরা ছুটে এল ওকে সাহায্য করতে।

"ধরে থাক অলকা," প্রাঞ্জল চেঁচিয়ে বলল, "আমরা আসছি।"

কিন্তু ওরা এসে পৌঁছাবার আগেই ঝোপটা গেল উপড়ে আর অলকা পড়ল নিচে। ভয়ে ওরা তাকিয়ে রইল জলের দিকে—ঝপাৎ করে জলে পড়ার শব্দ শুনবে বলে। কিন্তু কোন আওয়াজ ওদের কানে এল না। নিচে গিয়ে দেখল, অলকা দাঁড়িয়ে আছে। ভয়ে মুখ পাংশু, কিন্তু আঘাত লাগেনি।

ব্যাপার দেখে ওদের যেন বিশ্বাসই হয় না। অলকার পা দুটো এক ঝোপের মধ্যে আর ও যেন জলের ওপর দাঁড়িয়ে।

তুলতে গিয়ে আসল রহস্য বোঝা গেল। নদীর কিনারায় একটা নৌকা বাঁধা আর সেটাকে লুকিয়ে রাখার চেষ্টায় তার ওপর ঝোপঝাড়ের বোঝা। অলকা পড়েছে তারই ওপর।

"ভগবান বাঁচিয়েছেন।"

"কি ভয়ই যে পেয়েছিলাম, বলার নয়।"

"আমার তো খুব সন্দেহ হচ্ছে," মোংলা বলল।

প্রাঞ্জল জিজ্ঞেস করল, "কেন? নদীতে নৌকো বাঁধা—তাতে সন্দেহের কি আছে? আরও অনেকের নৌকোই এইভাবে নদীতে বাঁধা থাকে।"

মোংলা বলল, "থাকবে না কেন, কিন্তু কেউই এইভাবে নৌকোকে লুকিয়ে রাখার চেষ্টা কখন করে না।"

"আমারও মনে হচ্ছে ব্যাপারটা খুব সুবিধার নয়," রজবীর বলল, "এখান থেকে তাড়াতাড়ি সরে পড়াই ভাল।"

ওরা ঝোপঝাড়গুলো আবার নৌকোর ওপর ভাল করে সাজিয়ে রেখে বাড়ীর পথে পা বাড়াল। বাড়ীর কাছাকাছি এসেই বুঝল বেশ বড় ধরনের একটা কিছু ঘটে গেছে। কাজকর্ম ছেড়ে কর্মীরা দল বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে আর নিজেদের মধ্যে গুজগুজ করছে, মাঝে মাঝে



উত্তেজিত হয়ে হাত পা নাড়ছে। সুখোমনি ছুটে এল মোংলার কাছে। তার মন খুবই খারাপ "মোংলা রে," কাঁদো কাঁদো কণ্ঠে সে বলল, "পুলিশ তোর বাপকে আর ডেকাবাবুকে ধরে নিয়ে গেছে। পুলিশ বলেছে, ওরাই নাকি চোর।"

মোংলার মাথায় যেন বাজ পড়ল। চোখ দুটো ছলছল করে উঠল। প্রাঞ্জল ওর গলা জড়িয়ে একধারে টেনে নিয়ে গিয়ে ফিসফিস করে বলল, "ঠিক তিনটের সময় আমাদের বাড়ীর পেছনে টুলরুমে আসিস। যুদ্ধের সভা বসবে।"



ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

দুপুরে খেতে খেতে মিঃ বড়ুয়া বললেন, "আমি ঠিক জানি ডেকা আর বিরচী সম্পূর্ণ নির্দোষ। দুজনেই এই বাগানে কম করে কুড়ি বছর কাজ করছে।"

"পুলিশ তাহলে ওদের ধরল কেন?" প্রাঞ্জল প্রশ্ন করল।

"পুলিশের মতে গুদামে ঢোকার পথ যখন একটাই আর তালাটা ভাঙা নয় তখন তালাটা নিশ্চয় চাবি দিয়ে খোলা হয়েছিল আর পেটিগুলো চুরির পর তালাটা আবার বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। ডেকার কাছে চাবি থাকে আর বিরচী হল চৌকিদার। অতএব ওদের কারচুপি নিশ্চয় আছে।"

প্রাঞ্জল কিছু বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু ইসারা করে রজবীর ওকে থামিয়ে দিল।

দুপুরে ওরা জড় হল টুলরুমে। মোংলার মন খুবই খারাপ।

"এবার ঘটনা সাজিয়ে পুরো ব্যাপারটা বিচার করা যাক," রজবীর প্রস্তাব করল।

"যদি ধরে নেওয়া যায় যে ডেকাবাবু নির্দোষ, প্রাঞ্জল বলল, "তাহলে চোরেরা নিশ্চয় কোন নকল চাবি দিয়ে তালাটা খুলেছিল।"

মোংলা বলল, "তাহলে তো আমার বাবা দেখতেই পেত আর চিৎকার করে পাড়া মাথায় করত।"

"তবে বোঝাই যাচ্ছে যে, চোরেরা সামনের দরজা দিয়ে ঢোকেনি," কথাটা বলল প্রাঞ্জল

আর সবাই দিল সায়।

অলকা জিজ্ঞেস করে, "তাহলে ভেতরে ঢুকল কি-করে? ছাদ ভেঙে কিম্বা দেওয়ালে সিঁধ কেটে ঢুকতে পারত, কিন্তু তা তো করেনি।"

"আর একটা রাস্তা আছে," রজবীর বলল, "মাটির তলায় সুড়ঙ্গ কেটে মেঝের মধ্যে দিয়ে ওপরে উঠে আসা।"

"তাই-ই হবে।" প্রাঞ্জল উত্তেজনায় চিৎকার করে উঠল, "মনে আছে মোটা পায়ের দাগ? এক হপ্তা বৃষ্টি পড়েনি অথচ পায়ের দাগটা ছিল কাদামাটির।"

"ঠিকই তো," মোংলা মাথা নেড়ে বলল, "সুড়ঙ্গের মাটি তো ভিজেই হবে আর তাতেই বোঝা যায় আমার বাবা কেন কিছু দেখেনি।"

"কিন্তু আমরা তো গুদামটা ভাল করে দেখেছিলাম। কই সুড়ঙ্গের মতো তো কিছু দেখিনি," অলকা বলল।

"তখন ওদিকে আমরা দৃষ্টি দিইনি," রজবীর বেশ জোর গলায় বলল, "এবার দেব।" ঘুরে বলল, "মোংলা, গুদাম ঘরে আর একবার ঢোকা যায়?"

"দরজা তো খোলাই আছে, গুদাম যখন খালি। তালা তো কেউ বন্ধ করেনি।"

দল বেঁধে গিয়ে যখন দেখল যে, গুদামটা খোলা তখন ওরা হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। ভেতরটা আর একবার ভাল করে দেখতে দেখতে রজবীরের মুখ আনন্দে ঝলমল করে উঠল। "ঐ তো," চেঁচিয়ে বলল প্রাঞ্জলকে, "চেয়ে দেখ, ডেকাবাবুর টেবিলের তলায়।"

সকালে ওরা সবই দেখেছিল, কিন্তু টেবিলটা সরিয়ে দেখার কথা ভাবেনি। এবার দেখল আর দেখা মাত্রই ধরে ফেলল।

খুব মিহি আর চৌকো করে কাটা মানুষ ঢোকার মতন পথ। এত মিহি করে কাটা যে ওদিকে নজরই যেত না, যদি না লক্ষ্য ওদের স্থির থাকত। মোংলা একটা ছোট্ট ছুরি বার করে তার ফলাটা কাটার অংশে গুঁজে এদিক ওদিক ফলাটা ঘোরাল, যতক্ষণ না একটা আঙুল ঢোকাবার মতো জায়গা হল। কিনারাটা ভাল করে ধরে টান দিতেই পুরো টুকরোটা উঠে এল।

যখন দেখা গেল সরু সুড়ঙ্গের অন্ধকার মুখটা "ওরে বাবা!" বলে অলকা আঁতকে উঠল। এবার বেশ ভাল করেই বোঝা গেল যে, চোরেরা নিচে থেকে কাঠের মেঝেটা কেটে ছোট্ট একটা গুপ্ত দরজা বানিয়ে নিয়ে সেটা ঠেলে ওপরে উঠে এসেছিল আর পেটিগুলো

সরিয়ে ফেলার পর টেবিলটা যথাস্থানে রেখে নিচে নেমে গিয়েছিল। শেষ লোকটা নিচে নামবার পর কাটা কাঠটা নিচে থেকেই ঠিক জায়গা মতন বসিয়ে দিয়েছে।

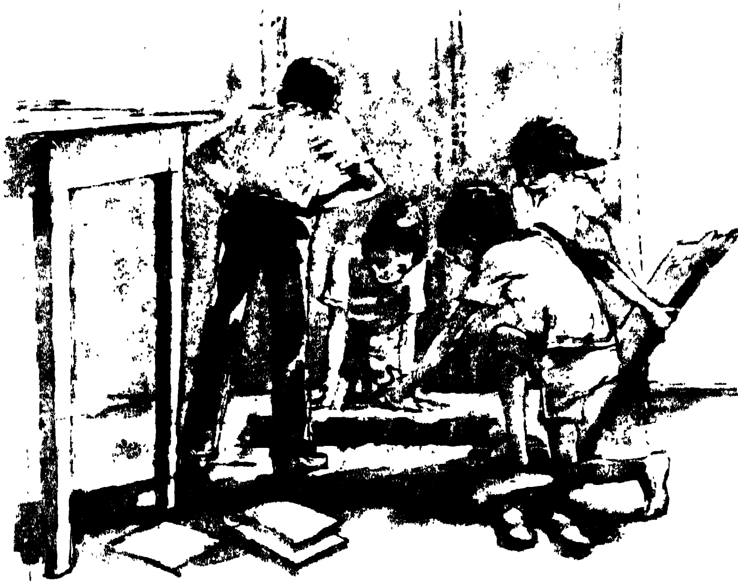
মোংলা কাঠটা আবার ঠিক জায়গাা রেখে দিয়ে বলল, "ব্যাপারটা এবার বোঝা গেল।"

রজবীর মাথা নেড়ে বলল, "খুব ভাল করে। তাছাড়া ঐ মাটির তাল আর লুকোন নৌকোর ব্যাপারটাও মিলে যাচ্ছে। ওরা সুড়ঙ্গ কেটে গুদামে ঢুকেছিল, আর চায়ের পেটিগুলো নিয়ে গিয়েছিল নদীর ধারে। নৌকোটা ব্যবহার করেছিল চোরাই মাল নদীর ওপারে চালান করার জন্যে। সেখানেও নিশ্চয় কোন ট্রাক পেটিগুলো নিয়ে পালাবার জন্যে তৈরি ছিল।"

"এবার তাহলে সুড়ঙ্গের অন্য মুখটা খোঁজা যাক।" মোংলা বলল।

"সুড়ঙ্গের মধ্যে দিয়েই তো যাওয়া যায়।" রজবীর বলল।

"আর সোজা যদি পৌঁছে যাই চোরদের চত্বরে?" মোংলা বলল, "তাহলে তো বিপদের অন্ত থাকবে না।"



"তাহলে খুঁজে পাব কি করে?" অলকা জানতে চাইল।

প্রাঞ্জল ডেকাবাবুর টেবিল থেকে কাগজ পেনসিল তুলে একটা এবড়ো খেবড়ো আঁক কেটে ওদের বোঝাতে বসল, "ব্যাপারটা খুবই স্বাভাবিক যে, চোরেরা সুড়ঙ্গটা নিশ্চয় শুরু করেছিল দক্ষিণে নদীর দিক থেকে। সুড়ঙ্গ খুব একটা বড় হওয়া সম্ভব নয়। হতে পারে বড়জোর শ খানেক মিটার। কাজেই যদি গুদাম থেকে নদী পর্যন্ত একটা সোজা লাইন টানি আর সেই অনুযায়ী গুদাম থেকে 50 আর 100 মিটারের মধ্যে আমরা খোঁজাখুঁজি করি, তাহলে সুড়ঙ্গের অন্য মুখটা নিশ্চয়ই পেয়ে যাব।"

গুদাম থেকে খুব সন্তর্পণে বের হয়ে ওরা গেল ওদের নির্ধারিত গন্তব্যে। দৈনিক কাজের সময় শেষ হয়েছে, কাজেই চা-ঝোপের ধারে কাছে কোন লোক নেই। ওরা হাঁটছিল অবশ্য বেপরোয়া, কিন্তু দৃষ্টি ছিল প্রখর। মোংলাই দেখল সবার আগে। সুড়ঙ্গের মুখটা ছিল একটা গভীর নালার ওপর দিকে। কাদামাটি দিয়ে লেপা একটা বাঁশের ফ্রেম বেশ চালাকি করে তার ওপর আটকান। সেটার ওপরও আবার বেশ কিছু ঝোপ ঝাড় লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে, যাতে ব্যাপারটা সহজে না কারো চোখে পড়ে।

মোংলা এক লাফে নিচে নেমে, ঢাকাটা সরিয়ে ব্যাপারটা ওদের দেখিয়ে দিল এবং ঢাকাটা আবার ঠিকমত লাগিয়ে ওপরে উঠে এসেই তাড়া দিয়ে বলল, "কেউ আমাদের এখানে দেখে ফেলার আগেই সটকে পড়া যাক।"

লম্বা লম্বা পা ফেলে টুলরুমে পৌঁছে প্রাঞ্জল গলা খাটো করে বলল, "আমার তো মনে হয়, বাবাকে সব কথা এখনই বলা দরকার। তাহলে উনি পুলিশকে বলে বিরচী আর ডেকাবাবুকে ছাড়িয়ে আনতে পারবেন।"

"না...না...এক্ষুনি নয়," রজবীর বাধা দিয়ে বলল, "চোরদের জানা দরকার যে, তারা নিরাপদে আছে।"

"ঠিক কথা," মোংলা সায় দিয়ে বলল, "আমাদের উচিত আরও কিছু প্রমাণ জড় করা।

"কি করে? প্রাঞ্জল প্রশ্ন করল।

"যে শ্রেণীর চা চুরি হয়েছে, সেটা ছিল সব চাইতে ভাল। এখন কথা হল, চোরেরা সে কথাটা জানল কি করে?"

"মানে? কি বলতে চাইছ তুমি?"

"খুবই সোজা। নিশ্চয় বাগানের কোন লোকের সঙ্গে ওদের যোগসাজস আছে।"



অলকা বলল, "সুড়ঙ্গ খুঁড়তে অনেক সময় লাগে। মাটি কাটতে হয়। সেই মাটি আবার সরিয়ে ফেলতে হয়। অথচ ভাবতে অবাক লাগছে যে, এত কাণ্ড হল আর কেউ সেটা জানতেই পারল না? তা কি করে হল?"

"খুব সোজা," রজবীর বলল, "ওরা নিশ্চয় অনেক রাত্রে কাজটা সেরেছিল।" রজবীরের এই কথাটা শুনেই মোংলার টনক নড়ল। খাটো গলায় কথার মধ্যে চিৎকার করে উঠল, "আরে বাব্বা। তাহলে নিশ্চয় সে..."

"এই... আস্তে...," সবাই ওকে সাবধান করে দিল।

"ঐ বেটা শাওন সর্দার। ও ছাড়া আর কেউ নয়।" মোংলা জিভ কেটে বলল।

"মানে ঐ লোকটা যার বলদ চিতায় নিয়ে গেছে?" প্রাঞ্জল প্রশ্ন করল।

"অ। তাহলে তোমরাও সে গল্প শুনেছ? ওইই তো ঐ গল্পটা রটিয়েছিল, যাতে ভয় পেয়ে কর্মীরা রাত্তিরে বাড়ীর বাইরে না বের হয়। ও ছাড়া আর কেউ কিন্তু চিতাটাকে কখনো দেখেনি।"

"ঠিক তো! মনে পড়েছে। বাবাও তো তাই বলেছিলেন, চিতার পায়ের দাগও কোথাও না কি দেখা যায়নি।"

"দেখা যাবে কি করে?" মোংলা বলল, "থাকলে তবে তো যাবে! আসলে শাওন গল্পটা চালু করেছিল যাতে চোরেরা সুড়ঙ্গটা নিরাপদে কাটতে পারে।"

আর কোন কথা নেই কারো মুখে। সবাই আপন আপন চিন্তায় মগ্ন।

"তা ছাড়া," মোংলা আবার বলল, "ফ্যাক্টরির প্যাকিং মেশিনে ও কাজ করে, তাই ওর পক্ষে জানা খুবই সোজা, কখন কি দরের চা প্যাক করা হচ্ছে। তাই না?"

সপ্তম পরিচ্ছেদ

পরদিন সকালে মিঃ বড়ুয়া সবাইকে নিয়ে গেলেন ফ্যাকটরি দেখাতে। "ভাবতে খুব অবাক লাগে," পথে যেতে যেতে রজবীর বলল, "এই সবুজ পাতা ফুটন্ত জলে দিলেই রং বদলে হয় সোনালী আভায় ঘন বাদামী।"

"তার কারণ, পাতার ভিজে ভিজে ভাবটা কোন রকম রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার না করেই আমরা কাটিয়ে দিই আর আসল রং আর সৌরভটা স্পষ্ট করে দিই। মেশিন দিয়ে কাজটা সহজে সারা হয়, একসঙ্গে অনেক কাজ করা যায় আর গুণটা বজায় থাকে। তবে চেষ্টা করলে সব কাজটা বাড়ীতেও করা যায়।"

"বাড়ীতে? কী করে?" রজবীর জানতে চাইল।

"কেন? যেমন করে আগে হত। পরিষ্কার নয়, কিন্তু হয়।"

"আচ্ছা কাকাবাবু, এ তো না হয় হল সবুজ চা। আপনি আরও দু রকম চায়ের কথা কিন্তু বলেছিলেন, সিটিসি আর অর্থডকস্। সেগুলো কি আলাদা?"

"নিশ্চয়ই। অর্থডকস অর্থাৎ সনাতনী চায়ে সৌরভ বেশী, সিটিসি তে পরিমাণ বেশী হয় আর রং ঘন। সনাতনীর পানা করতে হলে ফোটাতে হয়। সিটিসি ছাঁকতে হয়। তৈরি করার মধ্যে তফাৎ কি তা আমি তোমাদের ফ্যাকটরিতে গিয়ে বুঝিয়ে দেব।"

ফ্যাকটরির দারোয়ান সেলাম দিয়ে ওদের স্বাগত জানাল। মিঃ বড়ুয়া জীপটাকে রাখলেন

একটা লম্বা কাঠামোর তলায়। তার ছাদ আছে, কিন্তু দেওয়াল নেই। ভেতরে একটার কিছু ওপরে আর একটা, এইভাবে পরপর সাজান চট দিয়ে মোড়া কাঠের তাক।

এগুলোকে বলা হয় 'চ্যাং'। বাগান থেকে তুলে এনে পাতাগুলো ওজন করার পর এই তাকগুলোর ওপর ছড়িয়ে দেওয়া হয়। কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই পাতাগুলো শুকোতে আরম্ভ করে আর অর্ধেকের বেশী ভিজে ভিজে ভাবটা কেটে যায়। এটাকে বলা হয় 'স্বাভাবিক শুকানো'।

পাশেই ঠিক এই ধরণের আর একটা জায়গা। সেখানকার তাকগুলো আর চটে মোড়া কাঠ নয়, তলায় পুরু জাল দেওয়া লম্বা লম্বা সিমেন্টের দ্রোণী (পাত্র)। এতে চায়ের পাতাগুলো ছড়িয়ে দেওয়া হয় আর প্রত্যেক দ্রোণীর শেষ দিকে যে বিজলীর পাখা আছে তাই দিয়ে গরম বাতাস দেওয়া হয়।

মিঃ বড়ুয়া বুঝিয়ে বললেন, "একে বলা হয় 'নিয়ন্ত্রিত শুকানো'। এখানকার আবহাওয়া খানিকটা ভিজে বলে 'স্বাভাবিক শুকোনো' পদ্ধতিটা অনেক বেশী সময় নেয়। সেইজন্য এই পদ্ধতির প্রচলন। এতে সময় কম লাগে আর কাজও অনেক বেশী হয়।"

ওঁরা এবার ঢুকলেন ফ্যাকটরির ভেতর। সারা বাড়ীটা জুড়ে নানান কলকব্জার কান ফাটানো কলরব। বাধ্য হয়ে কথা বলার সুর সপ্তমে তুলতে হল। পাতা গুঁড়ানোর তীব্র গন্ধে চারিদিক ভরপুর।

তিন পায়ার একটা মেশিন দেখিয়ে মিঃ বড়ুয়া বললেন, "এটা হল রোলিং মেশিন যাতে শুকনো পাতাগুলো ভাঙা এবং পাকানো হয়, যার ফলে পাতার রস সমানভাবে ছড়িয়ে যায়।

তারপর গুঁড়ো আর পাকানো দাগগুলো ছাঁকবার জন্য জাল দেওয়া পাইপের মধ্যে পুরে দেওয়া হয়।

"আর এটা হল 'সিফটার' বা ঝাঁঝরি। এতে চায়ের পাতা আলাদা করা হয়। এরপরই অর্থডকস্ আর সিটিসি চায়ের পাতা তৈরির পদ্ধতি আলাদা হয়ে যায়। অর্থডকস্ শ্রেণীর জন্য ঝাঁঝরি দিয়ে আলাদা করা পাতা সরাসরি পাঠিয়ে দেওয়া হয় আলাদা একটা মেশিনে।"

"সিটিসি কথাটার মানে কি কাকাবাবু?"

"কার্লিং টিয়ারিং এন্ড ক্রাশিং। মেশিনটাও ঠিক তাই করে। কোমল মণ্ডের তাল মেশিন থেকে নিকাশ কল দিয়ে বেরিয়ে নিচে এলুমিনিয়মের ট্রেতে পড়ে।

"দেখেই বুঝতে পারছ যে, সিটিসি পদ্ধতিতে পাতাগুলো সম্পূর্ণভাবে কেটে আর রসটা নিংড়ে সমানভাবে মিশিয়ে ফেলা হয়, যাতে রসটা ভাল হয়। অর্থডকস্ চায়ে পাতাগুলো এত সূক্ষ্মভাবে কাটা হয় না। রসটা আস্তে আস্তে বার করা হয় যার ফলে সুগন্ধটা পুরোপুরি বজায় থাকে।"



এবার ওঁরা গেলেন চোলাই ঘরে যেখানে পাতাগুলো লম্বা লম্বা পাত্রে ছড়ান ছিল। চোলাই হচ্ছিল স্বাভাবিক নিয়মে। রজবীর আশ্চর্য হয়ে দেখল, ওর চোখের সামনেই সবুজ পাতা হয়ে যাচ্ছে ঘন বাদামী।

মিঃ বড়ুয়া বললেন, "পুরো চোলাই হতে লাগে ঘণ্টা খানেক। বাতাসে যে অক্সিজেন আছে, তার সঙ্গে পাতার রাসায়নিক পদার্থের প্রতিক্রিয়ার ফলে পাতার রং বদলায় আর সুগন্ধ স্পষ্ট হয়।"

এবার শুকোবার ঘর। মস্ত বড় বড় মেশিন। কয়লার আগুন থেকে অথবা বিশেষ তেল জ্বালানী উনুন থেকে উৎপন্ন খুব গরম বাতাস চোলাই করা চায়ের পাতার মধ্যে দিয়ে অনবরত বইছে। এর ফলে চা পাতার বাকি ভিজে ভিজে ভাবটা পুরোপুরি কেটে যাচ্ছে আর পাতাগুলো হয়ে উঠছে শুকনো ঝরঝরে। একমুঠো পাতা চট করে তুলে রজবীরের দিকে এগিয়ে দিয়ে মিঃ বড়ুয়া বললেন, "নাও, শুঁকে দেখ।"

পাতাগুলো গরম এবং সুগন্ধে ভরপুর।

"বাকি রইল পাতাগুলো আলাদা আলাদা শ্রেণীতে ভাগ করা যেমন —অরেঞ্জ পিকো, ব্রোকন অরেঞ্জ পিকো ইত্যাদি আর তাদের প্যাকিংয়ের ব্যবস্থা। শ্রেণী ভাগের কাজটা করা হয় ছোট বড় ফুটোর জাল দেওয়া বিভিন্ন আকারের এই সব মেশিন দিয়ে।"

শেষ পর্যায়ে ওঁরা এলেন যে ঘরে চা প্যাক করা হয়। মুখময় বসন্তের দাগ কাটা কদাকার এক কৃষ্ণকায় লোক বেলচা দিয়ে চা ঢালছিল কম্পমান এক মেশিনের ওপর রাখা চায়ের পেটিতে।

মোংলার কাছে শোনা চেহারার বর্ণনা থেকে লোকটাকে দেখেই দুই বন্ধু আর অলকা চট করে চিনে নিল যে, এই লোকটাই শাওন। বোঝা গেল, কি শ্রেণীর চা কোন পেটিতে কবে প্যাক হচ্ছে এটা জানা এই লোকটার পক্ষে খুবই সোজা।

"আর্দ্রতাই হল চায়ের পক্ষে বিশেষ ক্ষতিকারক," মিঃ বড়ুয়া বলতে শুরু করলেন বটে তবে লক্ষ্য করলেন না যে, ছোটদের দৃষ্টি অন্যদিকে। তিনি বলে গেলেন, "এই যে প্যাকিং মেশিন দেখছ, এটা সব সময় কাঁপতে থাকে, যাতে চা ভাল করে প্যাক হয় আর সামান্য বাতাসও যেন ভেতরে না থেকে যায়। তাছাড়া পাছে জলা বাতাস ফাঁক দিয়ে ভেতরে ঢোকে তাই পেটিতে যেখানেই কাঠের জোড় সেখানেই এলুমিনিয়ামের পাত এঁটে দেওয়া থাকে।"

যেই পেটি ভরে গেল, অমনি একজন ঢাকনা এঁটে দিয়ে পেরেক মেরে দিল। তারপর কোন শ্রেণীর চা আর বাগানের নাম ছক কাটা পাতের ওপর কালি বুলিয়ে চট করে লিখে দেওয়া হল।

"শ্রেণীর উৎকর্ষতা ভাল ভাবে বজায় রাখার জন্য প্রতিদিন তৈরি চায়ের নমুনা নিয়ে পরীক্ষা করা হয় আর চেখেও দেখা হয়। এক চুমুক মুখে দিয়েই আমি বলে দিতে পারি, চা ভাল না চোলাই কমবেশী হয়েছে বা ঠিক সেঁকা হয়নি।"

ফ্যাকটরির ভেতরে নানান শব্দে কান ধরে গিয়েছিল বলে বাইরের নিস্তব্ধতাটা ওদের কিছু অদ্ভুত মনে হল। বাড়ীর পথে যেতে যেতে ওরা শুনতে পেল সকালবেলার কাজ শেষের সাইরেন বাজছে।



অষ্টম পরিচ্ছেদ

বাগানের কাজ শেষ হল চারটের সময় আর ঠিক পাঁচটায় মোংলাকে সঙ্গে নিয়ে ওরা রওনা দিল বস্তির দিকে যেখানে কর্মীদের বাসা।

সামনে ওদের সারি সারি খড়ের চাল দেওয়া বাসা আর প্রত্যেকটার সঙ্গে কিছু জমি। মাঝে মাঝে প্রত্যেকের জন্য পল্লী-পাতকুয়া। মেয়েরা জল তুলছে, কাপড় কাচছে, গল্প করছে আর আশেপাশে শিশুরা ছুটোছুটি করে খেলছে। মেঠো পথে কিছু কুকুর এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছে আর কাদার মধ্যে শূয়োর ঘুরছে।

কর্মীদের ক্লাবের পাশের মাঠে ছেলেরা ফুটবল খেলা শুরু করেছে আর এদিক ওদিক অনেক চালা থেকে কানে আসছে রেডিওর গান। "নাচ আর গান আমাদের খুব ভাল লাগে", মোংলা উৎসাহে বলল, "সময় পেলেই সবাই মেতে উঠি।"

একটা চালার সামনে কিছু চাঞ্চল্য চোখে পড়তেই ওরা থেমে গেল। দেখল, চালার দরজাটা কাগজ-ফুল দিয়ে পরিপাটি করে সাজান আর সামনে গোল হয়ে বসে ছেলে বুড়োরা গান গাইছে। ছ' সাতজন মেয়ে আপোষে কোমর ধরাধরি করে সেই গানের সুরে নাচছে। তাদের পায়ের তালে তালে যেন সুনিপুণ আলপনার সৌন্দর্য।

মোংলা বলল, "ওরা ঝুমুর নাচছে। আমাদের অনেক উৎসব আছে যাতে ঝুমুর গানের সঙ্গে নাচ হয়। টুসু পুজো আর করমপুজো আমাদের উৎসব। আসামের বিহু, হোলি,

কালীপুজো সবই আমরা পালন করি।"

"এখন ওরা নাচছে কেন?" রজবীর জানতে চাইল।

"দিন সাতেক পরে কারো বিয়ে, তাই এখন থেকেই ওরা আনন্দে মেতে উঠেছে।"

বস্তির শেষ প্রান্তে শাওনের চালা। আগে থেকেই ব্যবস্থা মতো মোংলা বাইরে দাঁড়িয়ে রইল আর অলকাকে নিয়ে দুই বন্ধু গেল ভেতরে। শাওন মোড়া হাতে এগিয়ে এল ওদের অভ্যর্থনা করতে। মোড়ায় বসতে বসতে রজবীর বলল, "আমরা এলাম তোমার কাছে চিতাবাঘের গল্প শুনতে, যে চিতাটা তোমার বলদ তুলে নিয়ে গিয়েছিল।"

বোঝাই গেল শাওন কিছু অস্বস্তি বোধ করল। ভুরু তুলে ভাবতে লাগল ঠিক কী দেখেছিল। তারপর বুক ঠুকে বলতে শুরু করল, 'ও... সে তো প্রায় দিন পনেরোর কথা। হ্যাঁ, মনে পড়েছে। বুঝলেন, খুব অন্ধকার আর প্রচণ্ড বিষ্টি। হঠাৎ কানে এল পেছনের গোয়ালঘরে খুব গোলমাল হচ্ছে। ওখানে ছিল আমার দুটো বলদ। খুব চকচকে ধার দেওয়া দা হাতে নিয়ে আমি বেরিয়ে গেলাম। ওখানে কি দেখলাম জানেন? দেখলাম, ইয়া বড় এক চিতাবাঘ আমার একটা বলদের টুঁটি ধরে টেনে নিয়ে যাচ্ছে।"

"সঙ্গে আলো ছিল?" রজবীর জিজ্ঞেস করল।

"আলো? হ্যাঁ... মানে... না... না ছিল না। বুঝলেন না সাহেব, আমাদের ঘরে সে ছোট্ট পিদীম তাতে আর কতটুকু আলো হয়? আর ঐ ঝড়জলে কি আর কাজে লাগত?"

"ঠিক দেখেছিলে সেটা চিতা? রয়াল বেঙ্গল টাইগার নয়ত?" প্রাঞ্জল বলল।

"না... না... না... ছোটসাহেব। চিতা। আমি তার পিঠের ছাপ স্পষ্ট দেখেছি। ইয়া বড় বড়।"

"তারপর তুমি কী করলে?"

"কি আর করব? হায়না হলে না হয় হেদিয়ে দিতাম। কিন্তু চিতা। ওরে বাপরে, সাহস কি, যে সামনে যাই? চেঁচালাম। টিন বাজিয়ে পাড়া মাথায় তুললাম।"

"বলদের মৃতদেহটা পেয়েছিলে?"

"না ছোটসাহেব। খুঁজতে চেষ্টাও করিনি। কি হতো করে? মরেই তো গেছে।"

"পায়ের ছাপ দেখেছিলে?" রজবীর প্রশ্ন করল।

"থাকলে তবে তো দেখব। ছিলই না। বিষ্টিতে সব ধুয়ে গিয়েছিল।"

ওরা গেল গোয়ালঘরের দিকে, চালার পেছনে, চারদিকে ভাল করে চোখ রাখে।





"আমাদেরই বরাত খারাপ," রজবীর এদিক ওদিক ভাল করে তাকাতে তাকাতে বলল, "কোথায় ভেবেছিলাম চিতার সঙ্গে প্রচণ্ড যুদ্ধের গল্প শুনব তা নয় ভয় দেখিয়ে, দিলে তাকে ভাগিয়ে। যাক, কি আর করা যায়। আচ্ছা, এবার তাহলে আমরা যাই।"

ধন্যবাদ জানিয়ে ওরা বিদায় নিয়ে বেরিয়ে এল। সঙ্গে আসতে আসতে শাওন আমতা আমতা করে প্রশ্ন করল, "আচ্ছা ছোটসাহেব, ঐ যে ফ্যাকটরিতে চুরি হয়েছে, ঐ ব্যাপারে বড়সাহেব কি কিছু বলেছেন?"

"ও হ্যাঁ... হ্যাঁ...," প্রাঞ্জল বিনা দ্বিধায় সটাং মিথ্যে কথা বলে গেল, "সকালে পুলিশসাহেব বাবাকে টেলিফোন করেছিলেন। বলেছেন ডেকা আর বিরচী তাদের অপরাধ স্বীকার করেছে। দুজনেই।"

"স্বীকার করেছে?" আশ্চর্য হয়ে শাওন চোখ কপালে তুলল।

"হ্যাঁ। পুলিশ তাই এবার চুপচাপ। কিছু করার নেই। চোর যখন ধরা পড়েছে তখন করার আর কী থাকবে? তাই কাল থেকে আবার গুদামে মাল রাখা হবে। ফ্যাকটরিতে যে সব মাল আছে কাল আবার তা গুদামে পাঠান হবে।"

ওরা যখন গেল, শাওন তখন আনন্দে একেবারে আটখানা।

"কিছু ফল হল?" মোংলা জানতে চাইল।

"স্রেফ এক গাদা গুল দিল লোকটা।" রজবীর ব্যঙ্গ করে বলল, "অন্ধকার রাত, মুষলধারে বৃষ্টি, সঙ্গে আলো নেই, পায়ের ছাপ জলে ধুয়ে গেছে অথচ তবু বেটা জানে যে চিতাবাঘ। বলে কিনা পিঠের ছাপ দেখেছি।"

প্রাঞ্জল বলল, "পেছনের উঠোনটা আমরা বেশ ভাল করে দেখলাম। পুরোন বাঁশের বেড়া। কিন্তু কোথাও এতটুকু ভাঙাচোরা নেই। বলদ তো বাপু সামান্য জিনিস নয় আর চিতার সাধ্য কি বলদ নিয়ে বেড়া পার হবে লাফিয়ে! সত্যি যদি হতো বেড়াটা ভেঙে তছনছ হয়ে যেত।"

অলকা বলল, "বলদ গেছে কিন্তু লোকটার চেহারায় তার চিহ্ন মাত্র নেই। বলদ কিনতে অনেক টাকা লাগে অথচ লোকটা গরীব।"

"ঐ যা ভেবেছিলাম। লোকটার ওপর কড়া নজর রাখতেই হবে" কাথাটা বলল মোংলা।

"আমারও তাই মত।" প্রাঞ্জল বলল, "তাই তো ওর মনের মতো মিথ্যে কথাগুলো বেমালুম বলে দিলাম। এবার রাতে এসে দেখতে হবে লোকটা করে কী।"

নবম পরিচ্ছেদ

আন্দাজ রাত এগারোটার সময় দুই বন্ধু বিছানা ছেড়ে পা টিপে টিপে সিঁড়ি বেয়ে নেমে এল নিচে। বাংলো থেকে বেরিয়ে যখন টুল রুমের দিকে যাচ্ছে তখন ট্যাফিও ওদের পিছু নিল। রাত্রে সে ছাড়াই থাকে। প্রাঞ্জল বার দুয়েক টর্চের আলো দেখাতেই পেছনের ঘন অন্ধকার থেকে বেরিয়ে এসে মোংলা বলল, "তাড়াতাড়ি পা চালাও, সময় নেই।"

তিনজনে দ্রুত পায়ে চলল। চারিদিকে গভীর অন্ধকার। আকাশটা ঘন মেঘে ঢাকা। কালো কুচকুচে মেঘ। দূরে বিদ্যুৎ চমকে বুঝিয়ে দিচ্ছে যে ঝড় এল বলে।

বাগানের পথ মিলেমিশে সব একাকার হয়ে গেছে। মোংলা সঙ্গে আছে বলেই রক্ষে, না হলে ওরা ঠিক পথ হারিয়ে ফেলত। সে নির্ভুল পথ দেখিয়ে সোজা নিয়ে গেল শাওনের চালার ধারে।

বস্তির অন্য সব চালাই অন্ধকার, কেবল শাওনের ঘরে টিমটিম করে একটা প্রদীপ জ্বলছে। পা টিপেটিপে ওরা চালার ধারে গিয়ে উঁকি দিল বাঁশের জানলা দিয়ে।

শাওন কোথাও যাওয়ার জন্য তৈরি হচ্ছিল। ও দা তুলে নিল হাতে, আর এক ফুঁয়ে প্রদীপটা দিল নিভিয়ে। তারপর নিঃশব্দে দরজাটা খুলে বেরিয়ে এল বাইরে। ছেলেরা চট করে গা ঢাকা দিল গভীর অন্ধকারে। শাওন এক পলক চুপ করে দাঁড়িয়ে চারদিকে চোখ ঘুরিয়ে দেখে নিল কেউ ওকে দেখছে কি না।

তারপর হনহন করে হাঁটতে শুরু করল।

সাবধানে, দূর থেকে, সমান তালে ছেলেরা ওর পিছু নিল।

মাঝপথে হঠাৎ রজবীরের যেন দম বন্ধ হয়ে এল। একেবারে বিনা নোটিশে ওদের চারিদিক থেকে উচ্চস্বরে লম্বা টানা চিৎকার। প্রথমে একটা, তারপর অনেক। ভয়ে রজবীর প্রশ্ন করল, "কিসের গোলমাল?"

"শেয়াল," ফিসফিস করে মোংলা বুঝিয়ে দিল, "একটা ডাকলেই অন্যগুলো ডেকে ওঠে।"

প্রাঞ্জলের পেটও ভয়ে কিছু কম মোচড় দিচ্ছে না। গভীর অন্ধকার, চারদিকে গুমোট, মাঝে মাঝে বাঁশ ঝাড়ের মধ্যে দিয়ে বাতাস ছোটার আর্তনাদ আর থেকে থেকে শেয়ালের চিৎকার সব মিলিয়ে একটা যেন সর্বনাশের মরশুম। একবার এমন কথাও মনে হল, সত্যি যদি চিতাবাঘ এসে পড়ে।

বাগান পেরিয়ে শাওন এসে পড়ল বড় রাস্তায়। এখানে প্রতি রবিবার হাট বসে। সামনে এক সারি ছোট কিন্তু পাকা বাড়ী— ব্যবসাদারদের দোকান ঘর আর থাকার ব্যবস্থা, দুটোই একসঙ্গে। এরই একটায় ঢুকে শাওন কড়া নাড়ল।

মনে হল সংকেতের আদান প্রদানের পর কেউ একজন দরজা খুলে ওকে ভেতরে ঢুকিয়ে দরজায় আবার খিল দিল।

এই বাড়ী আর পাশের দোকানের মাঝখানে একটা অগভীর নর্দমা। পচা দুর্গন্ধ, ভাবলেও বমি আসে। কোনরকমে নাক বন্ধ করে ওরা নর্দমাটা পার হল আর পা টিপে টিপে পৌঁছে গেল আধ-খোলা জানলার ধারে। আগে, খুব সাবধানে মোংলা উঁকি মারল, তারপর জায়গা ছেড়ে দিল দুই বন্ধুকে।

ভেতরে বিছানার ওপর বসে পাঁচজন লোক তাস খেলছিল আর শাওন বসেছিল একটা কাঠের টুলের ওপর। লোকগুলোর চেহারা কদাকার, বীভৎস। শাওন কথা বলছিল একজন বড়সড় ষণ্ডামার্কা লোকের সঙ্গে। হাবভাবে মনে হল, ঐ লোকটাই দলের নেতা।

"পথ একদম পরিষ্কার," শাওন বলছিল লোকটাকে, "ডেকা আর বিরচী চুরি স্বীকার করেছে—ভগবানই জানেন কেন।"

"কেন আবার?" ষণ্ডামার্কা লোকটা বলল, "পুলিশের গুঁতো খাওয়ার ভয়ে কোর্টে গিয়ে অবশ্য উল্টো সুর গাইবে।"

"ম্যানেজার কাল থেকে আবার গুদামে মাল রাখবে। ফ্যাকটরি মালে ভরে গেছে। কালই





গুদামে সরাবে।"

"উনি অবশ্য জানেন না যে ভুল লোক ধরা পড়েছে।"

"এবার কোন শ্রেণীর চা রাখা হবে গুদামে?"

"বাগানের সব চেয়ে সেরা চা।"

কথাটা শুনে সর্দারের চেহারাটা আনন্দে ঝলমল করে উঠল। উৎসাহে বলল, "তাহলে কাল রাতেই হয়ে যাক আর এক দফা। কি বল?"

কথাটা কানে যেতেই খেলা থামিয়ে অন্য লোকগুলো ঘুরে বসল। একজন বলল, "কি দরকার খামোকা বিপদ মাথায় নিয়ে?"

"এত তাড়াতাড়ি আবার চুরি করায় বিপদ আছে", আর একজন বলল।

"একদম নয়," সর্দার জোর গলায় বলল, "আমাদের প্ল্যানে কোন খুঁত নেই। তাছাড়া তাক লাগিয়ে দেওয়ার সুবিধেও অনেক। চোর যখন ধরা পড়েছে তখন ওরা কেউ ভাববেই না যে আবার চুরি হতে পারে। আমরা প্রথমবার যা করেছিলাম কালও ঠিক তাই করব।"

"কিন্তু পুলিশ তাহলে বুঝে ফেলবে যে ডেকা আর বিরচী নির্দোষ। চোর অন্য কেউ," শাওন বলল।

"তাতে কি হয়েছে? আজ না হয় কাল সে কথা পুলিশ তো জানতেই পারবে। তার আগে যতটা পারা যায় মাল হাতিয়ে নেওয়া যাক।"

লোভ আর লালসায় লোকগুলোর চেহারা উজ্জ্বল হয়ে উঠল। এরপর ওদের মত করাতে সর্দারের কোনই অসুবিধা হল না। ছেলেরা আরও কিছুক্ষণ ওদের কথাবার্তা মন দিয়ে শুনে যখন বাড়ী ফিরছে, মোংলা বলল, "সর্দারটা কে জান তো? ও হল ঐ দোকানের মালিক। অন্যগুলোকে চিনতে পারলাম না।"

"আমাদের যা করার করেছি," প্রাঞ্জল বলল, "বাকিটা পুলিশের দায়িত্ব।"

মোংলা ওদের বাড়ী পৌঁছে দিয়ে অন্ধকারে মিশে গেল।

দশম পরিচ্ছেদ

দুই শালিকের ঝগড়ায় ওদের ঘুম ভাঙল খুব সকালে আর সঙ্গে সঙ্গে দুড়দাড় করে পৌঁছে গেল মিঃ বড়ুয়ার কাছে।

ওদের সব কথা—সুড়ঙ্গের কথা, নদীতে নৌকোর ব্যাপার, শাওনের সঙ্গে দোকানদারের যোগসাজস আর ওদের দলের সব কিছু উনি খুব মন দিয়ে শুনে পুলিশকে টেলিফোন করার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই কোটকি সাহেব নিজে এসে উপস্থিত। ছেলেরা উৎসাহে কথা বলতে আরম্ভ করার সঙ্গে সঙ্গেই উনি তাদের থামিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করলেন ঠিকই, কিন্তু সব কথা শুনতেই হল। যত শুনলেন তত লজ্জায় আর সংকোচে মুখটা ওঁর লাল হয়ে উঠল। শেষকালে ওদের প্রতি অন্যায় ভাবে কটূক্তি করার জন্য ক্ষমা চাইলেন এবং বলতে বাধ্য হলেন যে, "তোমরা সত্যিই অপূর্ব কাজ করেছ। এবার দলটাকে ধরার দায়িত্ব আমাদের। আজ যখন চুরি করতে আসছে তখন আর অসুবিধে নেই। ফাঁদ পাতলেই চলবে।"

মিঃ বড়ুয়া বাগানের একটা ম্যাপ বের করলেন। সেটা দেখতে দেখতে কোটকি সাহেব বললেন, "ফাঁদের সুন্দর জায়গা হল, সুড়ঙ্গের মুখ আর নৌকো। এই দু জায়গায় বেশ কয়েকজন পুলিশ মোতায়েন থাকবে চায়ের ঝোপে লুকিয়ে। আমি নিজে থাকব গুদামে আর সেইখান থেকেই সব কাজ সামলাবো।"

"এবারকার পেটিগুলো বেজায় ভারী," মিঃ বড়ুয়া বললেন, "আর নদীও তো বেশ দূরে।







অতটা পথ ওরা নিয়ে যাবে কি করে আমার তো মাথায় ঢুকছে না।"

"বাধ্য হয়ে কিছু যানবাহনের ব্যবস্থা ওদের করতেই হবে। কোনো মোটর গাড়ী নয়, এমন কিছু যা শব্দ করে না।"

"আপনার পুলিশকে সাহায্য করার জন্য বাগানের কর্মী দরকার?"

"সেটা ঠিক হবে না," কোটকি সাহেব বললেন, "অত রাত্রে বেশী লোক হলে ব্যাপারটা গোলমাল হয়ে যাবে। আমার লোক এসব ব্যাপারে তৈরি আর সঙ্গে বন্দুকও থাকবে। তারা

সবাই সাধারণ পোশাকে আসবে।'

"সেটা কি দরকার?" রজবীর বলল, "রাতের অন্ধকারে তো বোঝাই যাবে না কে কি পোশাক পরেছে।"

"আমার যা প্ল্যান তাতে সাধারণ পোশাকে পুলিশের আসা নিতান্ত দরকার। ভুললে চলবে না যে নদীর ওপারে ট্রাক নিশ্চয় ওদের তৈরি থাকবে। গতবারে যে পেটিগুলো চুরি হয়েছে সেগুলোও উদ্ধার করতেই হবে।" কিছু একটা ভেবে সবাইকে কাছে সরে আসতে বলে সাহেব আবার শুরু করলেন, "প্ল্যানটা তাহলে বলি....

☐

অনেক রাত। ঘুটঘুটে অন্ধকার। ঘন কালো মেঘে চাঁদ তারা সব কোথায় হারিয়ে গেছে। চারিদিকে গুমোট আর চুপচাপ। পুলিশ সশস্ত্র, সজাগ। চাপা উত্তেজনায় মুখচোখ তাদের কঠিন। গুদামের ভেতর কোটকি সাহেব নিজে তিনজন লোক নিয়ে পেটির পেছনে ওঁৎ পেতে। হাতে তাঁদের রিভলভার—তৈরি।

মিঃ বড়ুয়ার হাতে রাইফেল। সুড়ঙ্গের মুখ থেকে কিছু দূরে একটা ছায়া গাছের আড়ালে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে। তাঁরই কাছাকাছি রজবীর, প্রাঞ্জল, অলকা আর মোংলা গুটিশুটি বসে আছে। গভীর উত্তেজনায় বুক ধড়ফড় করছে। সামান্য শব্দের জন্য কান দুটো সকলের খাড়া। ঠিক পেছনে ট্যাফি, যেন ওদেরই ছায়া।

গায়ে ওরা নুন আর সিট্রোনেলা মেশান একটা মলম মেখেছে মশা আর জোঁক থেকে বাঁচবে বলে। মাথার ওপর বনবন করছে মশা। এ ছাড়া আর কোথাও কোন শব্দ নেই।

হঠাৎ ট্যাফি সোজা হয়ে বসে চাপা গলায় গর গর করতে লাগল আর সঙ্গে সঙ্গে সবাই সজাগ হয়ে উঠল। চোখ দিয়ে যেন গভীর অন্ধকারকে চৌচির করবে। শব্দ শুনেই সবাই বুঝে নিল যে একটা গরুর গাড়ী আসছে।

"শাওনের বলদ," মোংলা বলল, "যেটাকে চিতায় নিয়েছে বলেছিল।"

গাড়ী এসে থামল সুড়ঙ্গের মুখে। চারটে লোক লাফিয়ে নেমে ঝোপ ঝাড় দিয়ে ঢাকা বাঁশের ফ্রেমটাকে সুড়ঙ্গের মুখ থেকে সরিয়ে ফেলল।

ওদের তিনজন ঢুকে গেল সুড়ঙ্গের ভেতর আর একজন দাঁড়িয়ে রইল বাইরে।

হঠাৎ একটা দেশলায়ের কাঠি জ্বলে উঠল গরুর গাড়ীতে। গাড়োয়ান বিড়ি ধরাল। ঐ অল্প আলোতেই দেখা গেল লোকটার দাগ ভর্তি উৎকট মুখ। আর কেউ নয়—স্বয়ং শাওন।

মিনিট কুড়ি পরে সুড়ঙ্গের মুখে দেখা গেল চায়ের প্রথম পেটি। বাইরের লোকটা শাওনের সাহায্যে সেটা তুলে দিল গরুর গাড়ীতে।

চা ঝোপের আড়াল থেকে একজন পুলিশ চাপা গলায় বলল, "এইবার।" আর সঙ্গে সঙ্গে চারদিক থেকে রাইফেল বাগিয়ে বেরিয়ে এল পুরো একদল। শাওন আর তার সঙ্গী হতভম্ব হয়ে বোবার মতন দাঁড়িয়ে রইল। পুলিশ তাদের ঘিরে ফেলে হাতকড়া এঁটে দিল।

ওদিকে গুদামের ভেতর সর্দার যেই দ্বিতীয় পেটিতে হাত দিয়েছে অমনি কোটকি সাহেব আর লোকজন লাফিয়ে উঠলেন বন্দুক বাগিয়ে। লোকটা দলের সর্দার, উপস্থিত বুদ্ধি কিছু কম নয়। সেও নিজের রিভলভারটা বার করতে করতে লাফিয়ে পড়ল সুড়ঙ্গের মধ্যে।

কোটকি সাহেব গুলি চালালেন—একটাই। সেটা লাগল সর্দারের কাঁধের ঠিক নিচে। ব্যথায় আর্তনাদ করে সে পড়ে গেল সুড়ঙ্গের মধ্যে।



গুলির আওয়াজ শুনেই সুড়ঙ্গের মধ্যে যে অন্য দুজন ছিল, তারা পালাবার চেষ্টায় হামাগুড়ি দিয়ে সুড়ঙ্গের বাইরে আসতেই পুলিশ তাদের ধরে ফেলে পরিয়ে দিল হাতকড়া।

চারজনকে নিয়ে যাওয়া হল চা গুদামে। মিঃ বড়ুয়া আর ট্যাফি সমেত সবাই গেল সঙ্গে।

ওঁদের দেখেই এক গাল হেসে কোটকি সাহেব বললেন, "পুরো ব্যাপারটা বেশ ভালই হল মিঃ বড়ুয়া, কি বলেন? নৌকোতে এদের যে সঙ্গী অপেক্ষা করছিল সেও এল বলে।" লোকগুলো কটমট করে চেয়ে রইল কোটকি সাহেবের দিকে।

মিঃ বড়ুয়া লোক পাঠালেন বাগানের ডাক্তারবাবুকে ডেকে আনতে, আহত সর্দারকে দেখাশোনার জন্য। বুলেট এপার ওপার হয়ে গেলেও ক্ষতি খুব একটা কিছু হয়নি।

ডাক্তারবাবু যখন সর্দারের আঘাতটা পরীক্ষা করছেন, তখন নৌকোর লোকটাকে ধরে নিয়ে ঘরে ঢুকল গোমড়ামুখো ষণ্ডামার্কা একটা পুলিশ। বুক ফুলিয়ে বলল, "প্রায় পালিয়েছিল স্যার, জলে ডুব দিয়ে। কিন্তু যাবে কোথায়? ঠিক ধরেছি।"

এরপর চোর ধরার বাকি জালটা কোটকি সাহেব খুব সহজেই টেনে তুললেন সবাইকে



চমকে দিয়ে। ঘণ্টা দুয়েক সদলে চুপচাপ বসে রইলেন, যাতে দলের ওপারের লোকগুলোর মনে কোন রকম সন্দেহ না হয়। তারপর তাক বুঝে এক নৌকো বোঝাই পুলিশ নিয়ে পৌঁছে গেলেন ওপারে।

পথ দেখিয়ে নিয়ে গেল মাঝি আর সর্দার।

ট্রাক নিয়ে যে তিনজন লোক ওপারে অপেক্ষা করছিল মালের আশায়, চা পেটির বদলে সাদা পোশাকে নৌকো ভর্তি পুলিশ দেখে তাদের চক্ষু একেবারে ছানাবড়া। মুখে তাদের আর কথাটি নেই। বিনা বাক্য ব্যয়ে তারা আত্মসমর্পণ করল।

সেই রাত্রেই দলের কাছ থেকে সমস্ত খবর বের করে পুলিশ গেল পাশের একটা ছোট্ট শহরে আর সেখানকার একটা গুদাম থেকে সহজেই উদ্ধার করল আগের বারে চুরি করা চায়ের পেটিগুলো। একটা দুটো নয়, সব কটা।

রাতভোর হওয়ার আগেই চা পেটি চুরির সমস্ত রহস্য পুরোপুরি পরিষ্কার হয়ে গেল।।

□□

Printed at : Jupiter Offset Works, Snahadara, Delhi-110032